Vol. 44 | No. 3 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আহমদ শরীফের ব্যাকরণ-চর্চা

Volume	44
Issue	3
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকুল ইসলাম
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v44i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i3.2
Pages	11-19
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আহমদ শরীফের ব্যাকরণ-চর্চা

রফিকুল ইসলাম*

আহমদ শরীফের পরিচিতি পাকিস্তানী আমলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের রচিত বিভিন্ন কাব্যের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় আর বাংলাদেশ সময়ে একজন ব্যতিক্রমী ও তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ভিন্নমতাবলম্বী বা ডিসিডেন্টরূপে। কলকাতা থেকে ইংরেজ আমলে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'গুলিতে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান ছিল উপেক্ষিত, ফলে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস ছিল না। বাংলা সাহিত্যের পূর্ণ ইতিহাস রচনায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ এনামুল হকের ঐতিহাসিক ভূমিকার সঙ্গে আহমদ শরীফের নাম যুক্ত মধ্যযুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার জন্যে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত নিম্নোক্ত রচনাবলি স্মর্তব্য—দৌলত উজীর বাহরাম খানের *লায়লী মজনু* (১৯৫৭), মধ্যযুগের *পুঁথি পরিচিতি* (১৯৫৮), আলাওলের *তোহফা* (১৯৫৮), মুহম্মদ খানের *সত্যকলি বিবাদ সংবাদ* (১৯৫৯), মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী* (১৯৫৯), *মুসলিম কবির পদসাহিত্য* (১৯৬১), *মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ* (১৯৬২), জয়নুদ্দীনের *রসূল বিজয়* (১৯৬৪), মুজাম্মিলের *নীতিশাস্ত্রবার্তা* (১৯৬৫), *পুঁথির ফসল* (১৯৬৬), *শা' বারিদখান গ্রন্থাবলী* (১৯৬৬), *মধ্যযুগের রাগ তালনামা* (১৯৬৭), *কোরেশী মাগন বিরচিত চন্দ্রাবতী* (১৯৬৭), *বাঙলার সুফী সাহিত্য* (১৯৬৯), শেখ পরাণের *নসিহতনামা* (১৯৬৯), *সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলি ও তাঁর যুগ* (১৯৭২), দোনা গাজী চৌধুরীর *সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামাল* (১৯৭৫), *সওয়াল সাহিত্য* (১৯৭৬), আলাওলের *সিকান্দরনামা* (১৯৭৭), সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* (১৯৭৮), ও *রসূল চরিত* (১৯৭৮), শেখ মুত্তালিবের *কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব* (১৯৭৮), *বাউল কবি ফুলবাসউদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী* (১৯৮৮)। আহমদ শরীফের ঐসব পুঁথির পাণ্ডুলিপি পাঠ, সংকলন ও সম্পাদনা ছিল অত্যন্ত আয়াসসাধ্য, যান্ত্রিক অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয়, সেজন্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চাকারীগণ তাঁর প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবেন।

আহমদ শরীফের আধুনিক ও মৌলিক চিন্তাচেতনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলিতে: *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮), *সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা* (১৯৬৯), *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০) *জীবনে সমাজে সাহিত্যে* (১৯৭০), *যুগ-যন্ত্রণা* (১৯৭৪), *কালিক ভাবনা* (১৯৭৪), *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* (১৯৭৯), *কালের দর্পণে স্বদেশ* (১৯৮৫), *ইদানীং আমরা* (১৯৮৬), *বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা* (১৯৮৭), *বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি* (১৯৮৯), *বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র* (১৯৯০), *মানবতা ও*

* সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গণমুক্তি (১৯৯০), *সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা* (১৯৯১), *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা* (১৯৯১), *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালিত্ব* (১৯৯২), *জাগতিক চেতনার বিভিন্ন প্রসূণ* (১৯৯২), *সংস্কৃতি* (১৯৯২), *শাস্ত্র সমাজ ও নারী মুক্তি* (১৯৯৩), *সংকট : জীবনে ও মননে* (১৯৯৩), *মুক্তি নিহিত : নতুন চেতনায় ও নতুন চিন্তায়* (১৯৯৩), *প্রগতির বাধা ও পন্থা* (১৯৯৪), *এই শতকে আমাদের জীবনের রূপরেখা* (১৯৯৪), *সময় সমাজ মানুষ* (১৯৯৫), *দেশ কাল জীবনের দাবী ও সাক্ষ্য* (১৯৯৫), *স্বদেশ চিন্তা* (১৯৯৭), *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা* (১৯৯৭), *উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্তা* (১৯৯৭)। এছাড়াও দেশ ও সাহিত্যের ইতিহাস নিয়েও আহমদ শরীফের উল্লেখযোগ্য রচনা রয়েছে।

আহমদ শরীফ মধ্যযুগের পুঁথির পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় তাঁর গবেষণা জীবন শুরু করলেও তাঁর চিন্তা, চেতনা, ধ্যান, ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মননশীল প্রকাশের মাধ্যমেই পরিণত জীবন কাটিয়েছেন। বাংলাদেশে মৌলিক চিন্তাভাবনা করেন এমন মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এদেশে যাঁরা নিজেদের মনীষী বা চিন্তাবিদ মনে করেন তাদের অধিকাংশই চলতি হাওয়ার পন্থী, কারণ পারলৌকিকতার ওপর ইহলৌকিকতাকে স্থান দেবার ক্ষেত্রে তারা নিতান্তই ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রাপ্তিযোগের আশায় সংকীর্ণ দলীয় লেজুড়বৃত্তি আর প্রগতিশীলতার মুখোশ ধারণ পরস্পরবিরোধী, আমাদের দেশে খুব কম বুদ্ধিজীবীই এ স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত। আহমদ শরীফ এক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, তিনি কখনও কোনো সরকার বা দলের সমর্থন করেননি। এই এস্টাবলিসমেন্টবিরোধী ব্যক্তিত্বটি যথার্থই স্বাধীন মানুষ ছিলেন, কারণ তিনি চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় ছিলেন মৌলিক ও স্বাধীন। স্বাধীন বাংলাদেশে যদি যথার্থই কেউ স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তা এবং তার অকুণ্ঠ প্রকাশের দুরন্ত সাহস প্রদর্শন করে থাকেন তাহলে তিনি হচ্ছেন আহমদ শরীফ। এহেন এক চিন্তাবিদের ব্যাকরণ চিন্তা কি কম আকর্ষণীয়?

আহমদ শরীফের ব্যাকরণচর্চা স্কুল পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক হলেও তার পর্যালোচনা প্রয়োজন, হোক তা তাঁর প্রান্তিক ভাবনার ফসল। যার মধ্যে রয়েছে : ১। ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত *রচনা প্রবেশিকা* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রথম ভাগ সপ্তম শ্রেণীর জন্য আর দ্বিতীয় ভাগ নবম ও দশম শ্রেণীর ম্যাট্রিক ও হাইমাদ্রাসা পরীক্ষার্থীদের জন্যে নির্দিষ্ট। ২। আহমদ শরীফ রচিত *আধুনিক ব্যাকরণ* প্রথম ভাগ, পঞ্চম শ্রেণীর জন্যে ১৯৫৮ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। ৩। আহমদ শরীফ রচিত *ব্যাকরণ-মঞ্জরী* (১৯৬৬), পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী যাবতীয় স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর জন্য লিখিত। ৪। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ৭ম শ্রেণীর জন্যে অনুমোদিত *সহজ ব্যাকরণ,* চৌধুরী অছিউদ্দীন আহ্‌মদ ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে যুক্তভাবে রচিত এবং কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত প্রতিবছর পুনঃমুদ্রিত। ৫। *বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ,* সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর জন্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

কর্তৃক ১৯৭০ সালে অনুমোদিত, অজিতকুমার গুহ এবং শেখ আবুল ফজলের সঙ্গে মিলিতভাবে রচিত। ৬। আহমদ শরীফ রচিত *বাঙলা ভাষার কথা,* ১৯৭৯ এবং ১৯৯০ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নতুন পাঠক্রম অনুসারে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য পাঠ্য।

আহমদ শরীফ একক বা যৌথভাবে যেসব স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ বই রচনা করেছেন সেখানে ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদানের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে তা পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে সেগুলো গতানুগতিক না, তাতে কিছু অভিনবত্ব রয়েছে। প্রথমেই ভাষা ও ব্যাকরণের সংজ্ঞা, *রচনা প্রবেশিকা* প্রথম খণ্ড প্রথম ভাগ গ্রন্থে: "আমরা যাহা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করি তাহার নাম ভাষা।" "ভাষাকে শুদ্ধ করিয়া লিখিবার, পড়িবার ও বলিবার জন্য কতগুলি নিয়ম চলিত আছে। যে বিজ্ঞানের দ্বারা ভাষার বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া ঐ নিয়মগুলির বিধান করা হয় তাহাকে ভাষা বিজ্ঞান, শব্দ বিজ্ঞান অথবা ব্যাকরণ বলা হইয়া থাকে"। *আধুনিক ব্যাকরণ* গ্রন্থে প্রদত্ত ভাষা ও ব্যাকরণের সংজ্ঞা : "আমরা যেসকল কথা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করি উহাদের সমষ্টির নাম ভাষা"। "ভাষাকে বিশুদ্ধ করিয়া লিখিবার, পড়িবার বা বলিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম কানুন আছে। যে শাস্ত্রে ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া এ নিয়ম কানুনগুলি আলোচিত হইয়াছে তাহার নাম ব্যাকরণ।"

ব্যাকরণ মঞ্জরী গ্রন্থে ভাষা ও ব্যাকরণের সংজ্ঞা প্রথাগত নয়: "অনুভব শক্তিই জীবন। আবার ভাব ও চিন্তার মাধ্যমেই আমরা অনুভব করি। এই ভাব-চিন্তার বাহন হইল ভাষা। সুতরাং ভাষাই আমাদের জীবন-চেতনার অবলম্বন। ... ভাষার অপর নাম জীবন ভাষাই জীবন।" "যে মাতৃভাষা জীবনের চাবিকাঠি তাহার শব্দগঠন রহস্য বাক্যে শব্দবিন্যাস রীতি ও বাক্যের গঠন প্রকৃতি জানিবার কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। এই কৌতূহল নিবারণের জন্য ভাষা পরিচয়ের যে-শাস্ত্র তাহার নাম ব্যাকরণ।" "অতএব, যে-পুস্তকে ভাষার বিবরণ থাকে, তাহাই ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং ভাষার বিবরণের নাম ব্যাকরণ। ব্যাকরণ শব্দের অর্থ (বি+আ+কৃ+ অনট্) বিশ্লেষণ।" "ধ্বনি যোগে হয় শব্দ। শব্দ বিন্যাসে পাই বাক্য। বাক্যের সমষ্টিই ভাষা।" "অতএব মনের ভাব প্রকাশের জন্য মুখে উচ্চারিত সাংকেতিক তথা অর্থপূর্ণ ধ্বনির নাম ভাষা।" দেখা যাচ্ছে, আহমদ শরীফ রচিত প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাকরণ গ্রন্থে ভাষা ও ব্যাকরণের সংজ্ঞা প্রথাগত বা নির্দেশাত্মক ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত হলেও তৃতীয় ব্যাকরণ গ্রন্থে তা বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সংজ্ঞার কাছাকাছি। যৌথভাবে রচিত *সহজ ব্যাকরণ* গ্রন্থে ভাষা ও ব্যাকরণের সংজ্ঞা তাঁর দ্বিতীয় ব্যাকরণ অনুযায়ী হলেও অধিকতর সংহত ও স্পষ্ট: "মানুষের মুখে উচ্চারিত যে ধ্বনিসমূহ মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে, সেই ধ্বনিগুলির সমষ্টিগত নাম ভাষা।" "প্রত্যেক ভাষার দুইটি রূপ আছে। একটি মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের মুখের বুলি, অপরটি লিখিবার ভাষা।" "বর্ণের উচ্চারণ, শব্দগঠন, পদ-প্রকরণ বা বাক্যে শব্দ-বিন্যাস, বাক্য-গঠনও বাক্যগুলির বিন্যাস কিভাবে করিতে হয়, তাহার নিয়মাবলী যে পুস্তকে লিখিত, বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ব্যাকরণ পুস্তক বলে। ভাষার এই নিয়ম-পদ্ধতির সামগ্রিক নাম ব্যাকরণ।" "বাঙলা ভাষার কথিত বুলি সকল স্থানে একরূপ নহে; কিন্তু সাহিত্যের লিখিবার ভাষা এক। লিখিত বাঙলা

ভাষার রূপ দুইটি—সাধু ও চলিত ভাষা।" মিলিতভাবে রচিত *বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থে ভাষা ও ব্যাকরণের সংজ্ঞা পূর্বোক্ত ব্যাকরণের অনুরূপ কিন্তু আরও সুস্পষ্ট: "মানুষের মুখ হইতে উচ্চারিত কতকগুলি ধ্বনি, যাহা মনের ভাব প্রকাশ করে, উহাদের সমষ্টিই ভাষা অর্থাৎ ভাষা কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি মাত্র।" "আমরা যে ভাষায় কথা বলি, সেই ভাষা; আর একটি লেখ্য বা লিখিবার ভাষা।" "লেখ্য বা লিখিবার ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়।" "লেখ্য ভাষা আবার দুই রকমের, সাধু ও চলিত বা কথ্যভাষা।" *বাংলা ভাষার কথা* গ্রন্থে আহমদ শরীফের ভাষার সংজ্ঞা আরও অগ্রসরমান: "মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের ও ভাব প্রকাশের প্রধান ও সহজ মাধ্যম ভাষা।" "এই অর্থপূর্ণ ধ্বনি সমষ্টির নাম ভাষা। অতএব, কারো কোন ভাববাহী মুখের উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা। ধ্বনিকে সহজ ও ছোট করে বলার বা লেখার এ রীতির নাম কথ্য, চলতি বা চলিত রীতি। এ ভাষার নাম চলতি বা চলিত ভাষা। সাধুভাষা প্রাচীন রীতির ভাষা।" ভাষা ও ব্যাকরণের সংজ্ঞা প্রদানে আহমদ শরীফ ক্রমশ প্রথাগত ব্যাকরণ থেকে আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞার দিকে অগ্রসর হয়েছেন এটা তাঁর প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচায়ক।

ভাষা ও ব্যাকরণের পর ধ্বনি ও বর্ণের সংজ্ঞা আলোচ্য। *রচনা প্রবেশিকায়* ধ্বনির সংজ্ঞা : "আমরা মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যেসব ধ্বনি ব্যবহার করি সেগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। ... সুতরাং ইহাদিগকে বলা হয় ক্ষুদ্রতম ধ্বনি। যে চিহ্নের দ্বারা এই ক্ষুদ্রতম ধ্বনি লিখিত হয় তাহাকে বর্ণ বলে। ... বর্ণগুলিকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, অ, আ এই বর্ণগুলি অন্যবর্ণের সাহায্য ভিন্নই উচ্চারণ করা যায়। ইহাদিগকে স্বরবর্ণ বলে।"... "যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্যে উচ্চারিত হয় তাহাদিগকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। স্বর ও ব্যঞ্জনের এই সংজ্ঞা প্রথাগত, *আধুনিক ব্যাকরণ* গ্রন্থেও একই প্রকার সংজ্ঞা : "যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে না তাহাকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে।" "যে বর্ণ অন্যের সাহায্য ছাড়াই স্পষ্ট উচ্চারিত হয় তাহাকে স্বরবর্ণ বলে।" "স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের মিলিত নাম বর্ণমালা।" যৌথভাবে রচিত *সহজ ব্যাকরণ* গ্রন্থে বর্ণের সংজ্ঞা: "যে বর্ণ স্বয়ং অর্থাৎ অপর বর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয় তাহাকে স্বরবর্ণ (Vowel) বলে।" "স্বরের সাহায্যে যে বর্ণ উচ্চারিত হয় তাহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) বলে।" এ পর্যায়ে 'স্বন্ধিস্বর' (Dipthong) ও 'এককস্বর' (monopthong) এবং 'হ্রস্বস্বর' ও 'দীর্ঘস্বর'-এর আলোচনা ও উদাহরণ সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী, স্পর্শবর্ণ, বর্গীয়বর্ণ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ, শিস-ধ্বনি বা উষ্ম বর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ, অঘোষবর্ণ, ঘোষবর্ণ এবং উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ, তালব্যবর্ণ, মূর্ধন্য বর্ণ, দন্ত্যবর্ণ, ওষ্ঠ্যবর্ণ, কণ্ঠ্যতালব্য বর্ণ, কণ্ঠৌষ্ঠবর্ণ, দন্তৌষ্ঠ্যবর্ণ, কণ্ঠ ও আনুনাসিক বর্ণের আলোচনা রয়েছে। লক্ষণীয় যে বাংলা স্পর্শ বর্ণের সংখ্যা নির্দেশিত পঁচিশটি, যার বর্গীয়করণে নাসিক্য ব্যঞ্জন ঙ, ঞ, ণ, ন, ম-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারে বাংলায় স্পর্শ ধ্বনি বিশটি। আলোচ্য ব্যাকরণে উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ রীতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণগুলির পরিচয় নির্দেশ করা হলেও

বাক্‌যন্ত্র বা স্বরধ্বনি বিচারের মাপকাঠি অনুসারে স্বরবর্ণ নির্দেশিত না হওয়াতে 'বাঙলা ভাষায় বর্ণের ও শব্দের উচ্চারণ' শিরোনামে আলোচনাটি অস্পষ্ট। যুক্তভাবে রচিত *বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থে 'বর্ণপ্রকরণ' শিরোনামে বর্ণ পরিচয় নিম্নরূপ : "বর্ণগুলি আর কিছুই নহে, মানুষের মুখ নিঃসৃত কতকগুলি ধ্বনির প্রতীক বা চিহ্ন মাত্র।" "ধ্বনির এই প্রতীক বা চিহ্নগুলিকে বর্ণমালা (Alphabet) বলা হইয়া থাকে।" "যে বর্ণ স্বয়ং অর্থাৎ অপর বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হয় তাহাকে স্বরবর্ণ বলে।" "যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য লইয়া উচ্চারিত হয় তাহাদিগকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে।" "যে সমস্ত বর্ণ উচ্চারণের সময় আমরা জিহ্বার অগ্র, মধ্য বা মূল দ্বারা কণ্ঠ, তালু, দন্ত, মুর্ধা ও ওষ্ঠ ইত্যাদি স্পর্শ করিয়া থাকি উহাদিগকে স্পর্শ বর্ণ বলে।" আলোচ্য ব্যাকরণেও বাংলায় পঁচিশটি স্পর্শ বর্ণের কথা বলা হয়েছে এবং ঙ, ঞ, ণ, ন, ম নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলিকে স্পর্শ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এগুলি যে নাসিক্য বা অনুনাসিক বর্ণ তার উল্লেখও রয়েছে। "বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ ... ... এই বর্ণগুলির উচ্চারণের সময় কণ্ঠের স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়। ইহাদের উচ্চারণ গম্ভীর। এইজন্য এই বর্ণগুলিকে নাদবর্ণ বা ঘোষবর্ণ বলা হয়। আবার বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ... এই বর্ণগুলিকে উচ্চারণের সময় আমাদের স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না। ইহাদের উচ্চারণ মৃদু। এই জন্য ইহাদিগকে অঘোষ বা মৃদু বর্ণ বলা হইয়া থাকে।" "অতএব বর্ণের ধ্বনি প্রকৃতি অনুসারে বর্ণকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) ঘোষ বা নাদ বর্ণ, (২) অঘোষ বা মৃদু বর্ণ বলা হয়।" "উচ্চারণের গুরুত্ব হিসাবে স্পর্শবর্ণগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- ক, চ, ট, ত, প, ইহাদের উচ্চারণ লঘু। আবার গ, জ, ড, দ, ব, ইহাদের উচ্চারণ গুরু। খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ইহাদের উচ্চারণ লঘু। ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ ইহাদের উচ্চারণ গুরু। লঘু স্বরগুলিতে অল্পপ্রাণ ও গুরু স্বরগুলিকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে।" বলা বাহুল্য যে, স্পর্শ ব্যঞ্জন বর্ণের ঐ প্রকার 'মৃদু' ও 'গম্ভীর' এবং 'লঘু' ও 'গুরু' সংজ্ঞা ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারে যথার্থ নয়। ঘোষ-অঘোষ এবং স্বল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ-এর সংজ্ঞা ধ্বনিতত্ত্বে অনুরূপ নয়। ধ্বনিতত্ত্বে স্বরধ্বনি বিচারে চারটি মাপকাঠি যথা, জিহ্বার অবস্থান, জিহ্বার উচ্চতা, ওষ্ঠের আকৃতি বা পেশীসমূহের আপেক্ষিক অবস্থা আর ব্যঞ্জনধ্বনিকে উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস এবং ধ্বনি বিচার করা হয়। নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি 'উচ্চারণ নীতি'র অন্তর্গত সুতরাং ঐগুলি যেমন স্পর্শ বর্ণের অন্তর্গত নয় তেমনি ঘোষ-অঘোষ বা অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ বিভাজনেরও বাইরে। বাংলা স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি বিশটি ক, চ, ট, ত, প/ খ, ছ, ঠ, থ, ফ/ গ, জ, ড, দ, ব/ ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ / কেবল মাত্র এই বিশটি ধ্বনিকেই উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ এবং ঘোষ-অঘোষ ধ্বনিরূপে বিভাজন করা হয়। বাংলায় নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি তিনটি ঙ, ন, ম— উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী এগুলি স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি নয় সুতরাং অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ বা ঘোষ-অঘোষ বিভাজন অবান্তর। যুক্তভাবে রচিত *সহজ ব্যাকরণ* এবং *বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থে ঐ বিভ্রান্তির কারণ প্রথমে ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি বিচার শেষে ঐ স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ নির্দেশ করা হয়নি। ফলে ধ্বনি ও বর্ণের বিভ্রাট ঘটেছে।

বাংলা ভাষার কথা গ্রন্থে আহমদ শরীফ 'স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ' শিরোনামে স্বরধ্বনি সম্পর্কে যা লিখেছেন তা ধ্বনিতত্ত্বসম্মত : "স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে জিহ্বা মুখবিবরে নানাভাবে নড়ে বটে, কিন্তু কোন স্থান স্পর্শ করেনা।" আহমদ শরীফ উচ্চারণ স্থান অনুসারে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের শ্রেণী বিন্যাস এবং নামকরণ করেছেন একত্রে, সচরাচর ধ্বনিতত্ত্বে স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণ স্থান স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। সর্বোপরি তিনি 'স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্তকরণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তরূপ' শিরোনামে লিখেছেন, "বাংলা স্বরবর্ণগুলো যখন ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন 'অ' ব্যতীত প্রত্যেকটা স্বরবর্ণ একটি প্রতীকচিহ্ন গ্রহণ করে।" 'অ'-এর যেকোন 'কার' চিহ্ন নেই, ব্যঞ্জনবর্ণ এককভাবে ব্যবহৃত হলে যে সে-ব্যঞ্জনটি 'ব্যঞ্জনধ্বনি+অ'-এর প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয় তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা না করলেও একথা লেখা হয়েছে যে, "এই 'ক'-এর ধ্বনি পরিবর্তন করতে হলে স্বরবর্ণ যোগেই তা করা সম্ভব।" আরও লক্ষণীয় যে, আহমদ শরীফ বাংলার পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণকে স্পর্শ বর্ণরূপে উল্লেখের পরিবর্তে বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন। যেমন, কখ/গঘ/ঙ- ক বর্গ, চছ/জঝ/ঞ- চ বর্গ, টঠ/ডঢ/ণ-ট বর্গ, তথ/দধ/ন-ত বর্গ, পফ/বভ/ম-প বর্গ। ফলে পূর্বোক্ত যৌথভাবে রচিত দুটি ব্যাকরণে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম নাসিক্য ব্যঞ্জন বর্ণগুলিকে স্পর্শ বর্ণরূপে শ্রেণী বিন্যাস এবং ঘোষ/অঘোষ, অল্পপ্রাণ/মহাপ্রাণে বিভাজনের ভ্রান্তি এ বর্ণনায় কিছুটা হলেও দূরীভূত হয়েছে। আহমদ শরীফের *বাংলা ভাষার কথা* (১৯৯১) বাংলা ব্যাকরণ, তবে পুরোপুরি প্রথাগত নয় বরং বর্ণনামূলক সাংগঠনিক পদ্ধতিতে ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কাছাকাছি। তবে নাসিক্য ব্যঞ্জন বর্ণ সম্পর্কে এখানে লেখা হয়েছে, "আবার প্রতিবর্গের পঞ্চমবর্ণ -ঙ, ঞ, ণ, ন, এবং ম স্পর্শ ধ্বনি হলেও এ পাঁচটি ধ্বনি উচ্চারিত হতে নাকের সাহায্য লাগে, তাই এ ধ্বনিগুলিকে নাসিক্য বা অনুনাসিক ধ্বনিও বলে। কাজেই বর্ণগুলো নাসিক্য বা অনুনাসিক বর্ণ। এই পাঁচটির মধ্যে ধ্বনি সাদৃশ্যও আছে। এগুলো একাধারে স্পর্শ ও নাসিক্য ধ্বনি বা বর্ণ।" বলা বাহুল্য যে, বাংলা ঙ, ন, ম এই তিনটি ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণ স্থানে যথাক্রমে কণ্ঠ্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠ্য ধ্বনি, উচ্চারণ রীতিতে নাসিক্য। ভাষাতত্ত্বে ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে-স্বরধ্বনি অনুনাসিক আর ব্যঞ্জন ধ্বনি নাসিক্য, কোন ব্যঞ্জন ধ্বনির একাধারে নাসিক্য ও অনুনাসিক হওয়া সম্ভবপর নয়।

১৯৩৬ সালে প্রকাশিত *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে : "মনুষ্য জাতি যে ধ্বনি সকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম ভাষা (Language)। সাধারণত ঃ কোনও দেশের বা দেশবাসী জাতির নাম অনুসারে ভাষার নাম হইয়া থাকে।" তিনি ব্যাকরণের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন : "যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারা যায় তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ (Bangali Grammar)"। তিনি বাংলা ব্যাকরণের বিষয়সমূহকে প্রধানত পাঁচভাগ বা প্রকরণে বিভক্ত করেছেন : ধ্বনি প্রকরণ (Phonology), শব্দ প্রকরণ (Accidence), বাক্য প্রকরণ (Syntax) ছন্দ প্রকরণ (Prosody), অলঙ্কার প্রকরণ (Rhetorix)। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'ধ্বনি প্রকরণে বর্ণ, বর্ণের উচ্চারণ, বর্ণ বিন্যাস, সন্ধি, ণত্ব, ষত্ব

প্রভৃতি ধ্বনি সম্বন্ধে ব্যাকরণের বিষয়গুলি' আলোচনা করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন: "মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন সমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।" তিনি ব্যাকরণের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন : "যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষার গঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ (Grammar) বলে।" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণের বিভাগ করেছেন এভাবে: ১। ভাষার ধ্বনি (Sounds)—ধ্বনি-তত্ত্ব (Phonology), ভাষাগত ধ্বনিগুলির উচ্চারণ (Phonetics), ধ্বনিগুলির ক্রিয়া (Phonology), ভাষার শিষ্ট সমাজে প্রচলিত উচ্চারণ (Orthoepy), ছন্দোবিধি (Metrics, Prosody), বর্ণ-বিন্যাস (Orthography), যতিচ্ছেদ বিধান (Punctuation), ২। ভাষার শব্দের রূপ (Forms)—রূপ-তত্ত্ব (Morphology) বা প্রক্রিয়া (Accidence), শব্দ ও পদ সাধন (Etymology বা Affixation ও Inflexion), কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় (Primary and Secondary Formative affixes), সমাস (Composition), সুপ্-তিঙ্ (Noun and Verb Inflexion), তথা অব্যয় বা নিপাত (Indeelinabler, Particles); ৩। ভাষার বাক্যগত শব্দের ক্রম (Word order) বা বাক্যরীতি (Syntax)র বাক্য বিশ্লেষণ (Analysis of Sentence)। দেখা যাচ্ছে, ১৯৪০ সালের মধ্যে বাংলা ব্যাকরণ চর্চায় ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যরীতি (Syntax)র ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু আহমদ শরীফ একক বা যৌথভাবে বিশ শতকের পঞ্চম দশক থেকে নব্বই দশকের সূচনাকাল পর্যন্ত স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে 'ধ্বনিতত্ত্ব', 'রূপতত্ত্ব', 'বাক্যরীতি' এই তিনটি বহুল ব্যবহৃত ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষা ব্যবহার করেননি। তিনি 'বর্ণপ্রকরণ', 'শব্দপ্রকরণ', 'বাক্যপ্রকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। আহমদ শরীফ রচিত প্রথম ব্যাকরণ রচনা *প্রবেশিকা*তে 'ধ্বনি ও বর্ণ', 'উচ্চারণ বিধি', 'তৎসম শব্দে ধ্বনি পরিবর্তন', 'চলিত বাংলায় ধ্বনি পরিবর্তন', 'সন্ধি প্রকরণ' সম্পর্কিত আলোচনার পরেই 'পদপরিচয়' সন্নিবেশিত, তারপরে 'শব্দবিভক্তি', 'কারক প্রকরণ', 'লিঙ্গ'। এই ব্যাকরণে 'ক্রিয়াপদ', 'বিশেষণের তারতম্য', 'সমাস', 'অব্যয় পদ', 'তদ্ধিত প্রত্যয়', 'কৃৎপ্রত্যয়', 'সমাস' সম্পর্কে আলোচনার পর আবার 'পদসমূহের প্রয়োগ' বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। যেখানে রয়েছে বিশেষ্য, বিশেষণ, শব্দ বিভাগ, বিশিষ্ট বাক্যাংশের প্রয়োগ, প্রবচন বাক্য। এরপর 'বাক্যপ্রকরণ' আলোচনায় এসেছে সরল বাক্য, বাক্য সম্প্রসারণ, মিশ্র ও যৌগিক বাক্য, সরল ও জটিল বাক্যের পরস্পর পরিবর্তন, বাক্য সংকোচন, বাক্য সংযোজন ও বাক্য বিয়োজন প্রভৃতি বিষয়। ভাষার ব্যাকরণ আলোচনায় প্রথম 'ধ্বনিতত্ত্ব', তারপর 'রূপতত্ত্ব', শেষে বাক্যতত্ত্ব পর্যালোচনা করলে কাঠামোগত অসংগতি এবং পুনরাবৃত্তি পরিহার করা যায়। আহমদ শরীফ *আধুনিক ব্যাকরণ* (১৯৫৮) প্রথম ভাগে সূচনা, লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিবর্তন, কারক-বিভক্তির ব্যবহার, বিশেষণের তারতম্য, সংখ্যাবাচক ও

পূরণবাচক শব্দ, ক্রিয়াপদ, ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ, ক্রিয়া বিভক্তি, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, ক্রিয়ার ভাব, অব্যয়, শব্দ, সমাস, বাক্যের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। *ব্যাকরণ মঞ্জরী* (১৯৬৬) গ্রন্থে আহমদ শরীফ উপক্রমণিকার পরে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সব্যয় পদের অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়াপদ; এছাড়া অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়, নিত্যসম্বন্ধী পদ, উপসর্গ, ক্রিয়াপদ, বাচ্য, ক্রিয়াপদের কাল, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া, কৃৎ প্রত্যয়, উক্তি পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এককভাবে রচিত *বাংলা ভাষার কথা* (১৯৯১) গ্রন্থে আহমদ শরীফ ভাষার গোড়ার কথা, ভাষার উপাদান, শব্দ পরিচয়, সন্ধি, বাক্য, পদ পরিচয়, বচন ও পুরুষ, ক্রিয়া, লিঙ্গ, পদ পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম, লিঙ্গ, কারক, সমাস নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রথাগত ব্যাকরণ রচনায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ব্যাকরণের যে কাঠামো তুলে ধরেন তাতে মোটামুটিভাবে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যরীতি এই তিন পর্যায়ে বিশ্লেষণ ক্রম অনুসৃত, পরবর্তীকালে মুহম্মদ এনামুল হকও বাংলা ব্যাকরণ রচনায় একই রীতির অনুসরণ করেছেন, কিন্তু আহমদ শরীফ বাংলা ব্যাকরণ চর্চায় ঐ প্রক্রিয়া সরাসরি গ্রহণ করেননি। আহমদ শরীফ বিশ শতকের পঞ্চাশ থেকে নব্বইয়ের দশকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ব্যাকরণ রচনা করেছেন, ঐসময় ঢাকায় আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার ধ্বনি, রূপ ও বাক্ সংগঠন বিশ্লেষণমূলক বেশকিছু ভাষাতত্ত্বগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, কাজী দীন মুহম্মদ, রফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, হুমায়ুন আজাদ রচিত ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থাবলির প্রকাশকাল বিশ শতকের ষাট, সত্তর ও আশির দশক। আহমদ শরীফ একই সময়ে বাংলা ব্যাকরণ চর্চা করলেও সচেতনভাবে আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি পরিহার করেছেন মনে হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উভয়ে দেশে ও বিদেশে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন, প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ রচনার এই দুই পথিকৃৎ তাঁদের আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান ব্যাকরণ রচনায় কিছু কিছু প্রয়োগ করেছেন, বিশেষত ধ্বনিতত্ত্ব বিশ্লেষণে। বাংলা ধ্বনি এবং ধ্বনির প্রতীক বর্ণ ব্যবহার পর্যালোচনা তারা করেছেন, আহমদ শরীফ বাংলা বর্ণ বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'রূপতত্ত্ব' বিশ্লেষণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাকরণে রয়েছে শব্দ, শব্দ গঠন, শব্দের গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ, মৌলিক ও সাধিত শব্দের শেণীবিন্যাস, প্রকৃতি বা ধাতু, প্রত্যয়, বিভক্তি, শব্দের অর্থ-মূলক শ্রেণীবিভাগ, বাক্য ও বাক্যগত বিভিন্ন প্রকারের পদ, কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়, উপসর্গ, সমাস, শব্দদ্বৈত, শব্দরূপ নাম-পর্যায়। বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া-পর্যায়, কাল ও পুরুষ, অসম্পূর্ণ ধাতু, অব্যয় নিয়ে সুনীতিকুমার আলোচনা করেছেন। 'বাক্যরীতি' পর্যায়ে উদ্দেশ্য ও বিধেয়, বাক্য-রচনার লক্ষণীয় বিষয়, বাক্যের উক্তিভেদ, বাক্যের রচনার প্রকার (সরল, মিশ্র, যৌগিক বা সংযুক্ত), বাক্যে পদের ক্রম নিয়ে আলোচনা করেছেন। আহমদ শরীফ তাঁর শেষ ব্যাকরণ *বাংলা ভাষার কথা* (১৯৯১) গ্রন্থে শব্দ পরিচয়ে স্বর, ব্যঞ্জন, বিসর্গ সন্ধি, বাক্য প্রসঙ্গে বাক্য গঠন ও বাক্যের প্রকার ভেদ, পদ-পরিচয়

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম অব্যয় এবং বচন ও পুরুষ, ক্রিয়া সম্পর্কে সমাপিকা ও অসমাপিকা, কাল, পুরুষ, বিভক্তি, লিঙ্গ, পদ পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম কারক ও সমাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। আহমদ শরীফের বাংলা ব্যাকরণ পর্যালোচনায় ভাষার রূপ ও বাক্ সংগঠন বিশ্লেষণ মিশ্রিত, আবার অবিমিশ্র নয় ধ্বনি ও রূপ সংগঠনের পর্যালোচনা। মনে হয়, বাংলা ব্যাকরণ রচনায় আহমদ শরীফ একদিকে যেমন তাঁর পূর্বসূরি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাকরণের ছক পরিহার করতে সক্রিয় ছিলেন, তেমনি সচেতন ছিলেন সতীর্থ ও সমকালীন মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্ববিদের আলোচনা দ্বারা প্রভাবিত না হতে। সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে ব্যাকরণ রচনায় অবশ্য মৌলিক ভাবনার অবকাশ কম।